স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী মুক্তিযুদ্ধে সংবাদ-সাময়িকীপত্র

জাফর ওয়াজেদ

ফিরে যদি তাকাই পেছনে, পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ পানে, তবে দেখতে পাই–মৃত্যু, নৃশংসতা, নির্বিচারে গণহত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানি, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ঘরবাড়ি ছেড়ে স্বজন হারিয়ে কোটি মানুষের দেশত্যাগ, শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়। দেখতে পাই, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বলতম অর্জন-পর্ব 'মুক্তিযুদ্ধ'। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধরত ছাত্র, যুবা, কৃষক, শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, সেনা, পুলিশ, ইপিআর, আনসারসহ নানা পেশার মানুষকে। সাহসে, অঙ্গীকারে, বীরত্বে, আত্মদানে, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য বানিয়ে সম্মুখসমরে শত্রুহননে মত্ত হওয়ার এমন দিন বাঙালির ইতিহাসে আর কখনোই আসেনি। এটা অনস্বীকার্য যে, বাঙালি জাতির ধারাবাহিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্মিলিত ফসল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল বাঙালির জাতিসত্তা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মানুসন্ধানের লড়াই। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর আত্মপরিচয় তুলে ধরার ভিত্তি বলা যায় মুক্তিযুদ্ধ। শিশুঘাতী, নারীঘাতী, বর্বরতম প্রতিরোধে এমন সম্মিলিত সংগ্রামের ইতিহাস, নিজের বুকের রক্তে এমন করে আগে কখনো লেখেনি জাতি বাঙালি।

পঞ্চাশ বছর আগে আরও দেখতে পাই, অহিংস গণ-অসহযোগ আন্দোলন থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ; সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার রক্ত পতাকাত্তোলন। বিশ শতকের বিশ্ব রাজনীতিতে এমন ঘটনা অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় যেমন, তেমনই অভূতপূর্বও। এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে দেখা গেছে, বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ববোধের এবং সহমর্মী, সহকর্মী, সমব্যথী, সমচেতনার, সদাজাগ্রত থাকার সময়কাল। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের শুধু অসাধারণ ঘটনাই নয়, স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসের অসাধারণ ঘটনা। এই যুদ্ধে বাঙালি জনগণের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। সাধারণ বাঙালি সশস্ত্রভাবে পাকিস্তানি হানাদার ও দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধে মত্ত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জনগণের যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ। স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সেসময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার পক্ষে। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর বিদ্রোহী সদস্য থেকে শুরু করে লাখ লাখ ছাত্র-তরুণ-যুবক-নারী-কৃষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, নার্স, প্রকৌশলী, সরকারি চাকরিজীবী, কলকারখানার শ্রমিক, ঘাটের মাঝি, মাঠের কৃষকসহ নাম না-জানা বাঙালি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরে দখলদার হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। অনেকে ধরা পড়েন, তারা আর ফিরে আসেননি। জল্লাদরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি। গণকবর আর বধ্যভূমিতে আকীর্ণ বাংলাদেশ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। সব যুদ্ধেরই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরোধিতা করাটাই স্বাভাবিক। আর এই বিরোধিতা যে কেবল ভূমিতে, আকাশে, জলপথে মারণাস্ত্র নিয়ে লড়াই, তা-ই শুধু নয়। বিরোধিতার চূড়ান্ত পরিণামে যে সংঘর্ষ তাতে যেমন সামরিক কৌশল ব্যবহার করা হয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যোগাযোগীয় কৌশলও ব্যবহৃত হয়। পুরাকাল থেকেই যোগাযোগ তথা গণমাধ্যম তাই যুদ্ধের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অনস্বীকার্য যে, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রজন্মের চূড়ান্ত ঘটনা। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর আলবদর, আলশামস, রাজাকার ও দালালরা পরাজিত হয়। হানাদাররা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুদ্ধ ও সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক সব সময়ই সাংঘর্ষিক। যে কোনো যুদ্ধে, প্রাচীন হোক অথবা বর্তমানকালের হোক, যোগাযোগমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে স্বার্থ ভিন্নতার বিষয়টি বড়ো বাস্তবতা। সংবাদমাধ্যমের মূল কাজ সত্য প্রকাশ করা। ঘটনার অনুপুঙ্খ তথ্য পাঠযোগ্যভাবে সংবাদ ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। যুদ্ধে প্রধানত দুটি পক্ষ থাকে। সংবাদমাধ্যমের আদর্শিক অঙ্গীকারের জন্য দুটি পক্ষ সম্পর্কে,

যুদ্ধযুদ্ধ ঘটনার দৈনন্দিন ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমের পেশাগত দায়বদ্ধতার অংশ। এমনকি জাতিগত, রাষ্ট্রগত কিংবা রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত কারণে যে পক্ষকে একটি সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে, সেক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু যুদ্ধকালে এ ব্যাপারটি ঘটে না। বরং সংবাদমাধ্যম হয়ে ওঠে সাবেক যুদ্ধভূমি। শুধু তা-ই নয়, কৌশলগত প্রয়োজনেই যুদ্ধমান সামরিক বাহিনী কিংবা সরকার সংবাদমাধ্যমকে সব তথ্য দেয় না। তথ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণে বাধা দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সাংবাদিকদের টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদ অফিসে পৌঁছাতে হতো। অবশ্য এ সময়কালে কেবল সংযোগ আরও বিস্তৃত হয়েছে। যুদ্ধ 'কাভার' করার ক্ষেত্রে 'রিয়েল টাইম লাইভ রিপোর্টিং' বলতে যা বোঝায়, তার শুরু কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেতারের মাধ্যমে। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। এভাবেই যুদ্ধে বাস্তবতা, দৃশ্য-শব্দ, মৃত্যু, ধ্বংস, আহাজারি মানুষের বসার ঘরে ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড চিত্র ও বিদেশি টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের কল্যাণে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছেন।

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত এদেশে মোট তেইশটি (২৩) দৈনিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ছিল বেতার এবং পরবর্তীকালে টেলিভিশনও। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় চব্বিশ (২৪) বছর, অল্পকিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সংবাদমাধ্যম বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সফল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। কিন্তু পঁচিশে মার্চ হানাদার বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর আওতায় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পর এসব পত্রিকা সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। কয়েকটি পত্রিকা অফিস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। শুধু সংবাদপত্রই নয়, বেতার-টিভিসহ পুরো যোগাযোগব্যবস্থারই নিয়ন্ত্রণ নেয় দখলদার পাকবাহিনী। দেশের বাস্তব অবস্থা দেশি-বিদেশি জনগণ যাতে জানতে না পারে, সেজন্য সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করেছিল। আরোপিত হয়েছিল সেন্সরশিপ। তাদের নৃশংস তৎপরতাকে ধামাচাপা দিতে যতই কলাকৌশলের আশ্রয় নিক না কেন তাতে কামিয়াব হয়নি। দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, বাঙালি যে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, সেসব প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা ছিল শক্তাশক্তি। মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী, ভারতের চর, ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের দুশমন অভিধা দেওয়া হতো সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমে। দখলদার পাকিস্তানিরা সারাদেশে গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি নিধনে মত্ত থাকলেও সেসব খবরাখবর তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, বেতার-টিভিতে প্রচার হতো না। অবরুদ্ধ দেশে বাঙালি এসব খবরাখবর মোটেই বিশ্বাস করেনি। বরং স্বাধীনতাকামী বাঙালিই বাঙালির কাছে খবর পৌঁছে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিশেষ করে বেতার এ সময় হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাঙালির তথ্য চাহিদাপূরণের নির্ভরযোগ্য উপায়। ভারতসহ বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবরও বেতার থেকে উদ্ধৃত করা হতো। সেসব সংবাদপত্র এদেশে না এলেও বিদেশি বেতারের কল্যাণে তা জানা হয়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রণাঙ্গন তখন হয়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। পঁচিশে মার্চ গণহত্যা শুরুর পরদিনই ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের পর সারাদেশের মানুষ জনযুদ্ধে নেমেছিল। সেসময় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে পারেনি বেশ কিছুকাল। যুদ্ধকালে দেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সেসময় পালন করেছিল ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এসব মাধ্যমে কর্মরত শব্দসৈনিকেরা মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতাবোধ ও চেতনাকে সংহত ও শাণিত করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দেশকে হানাদারমুক্ত করার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। দখলদার বাহিনীর প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যাচার প্রচারযন্ত্রের বিপরীতে স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বিবিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

মুক্তাঞ্চল থেকে বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, সিপিবি সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করত নিয়মিত। বাংলার বাণীও সেসময় প্রকাশ হতে থাকে। কলকাতায় বাংলা ইংরেজি পত্রিকাতেও মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর থাকত। সেসব পত্রপত্রিকা যাতে দেশের ভেতরে না আসতে পারে, সেজন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল দলখদার হানাদার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ১১০নং সামরিক বিধি জারি করে। উল্লেখ করার বিষয় এখানে যে, এসব বিধিনিষেধ, কালাকানুন–সবই এক পর্যায়ে এসে এদেশের সাংবাদিকরা ভঙ্গ করেছেন। এর আগে ১৯৫৮ সালের সামরিক অধ্যাদেশে সংবাদপত্রের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সাংবাদিকরা এসব আইনের বিরুদ্ধে নানা সময়ে প্রতিবাদীও হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাস, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। জাতীয় চেতনাকে শাণিত করার এই অস্ত্রটিকে দখলে আনার জন্য পাকিস্তানি জান্তা শাসকদের চেষ্টার অবধি ছিল না।

সংবাদপত্র কেবল মানুষকে তথ্য দেয় না, জনগণকে শিক্ষিত করে, জনচৈতন্য এবং জনমতকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই পূর্ববঙ্গে স্বাধীন সংবাদপত্র যাতে বিকশিত না হয়, সেজন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই। পাকিস্তানি উপনিবেশ আমলে চব্বিশ বছরে এদেশে সাংবাদিকতা বিকাশের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কাল পর্যন্ত প্রথম পর্ব। সামরিক শাসনের কাল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দ্বিতীয় পর্ব এবং ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। প্রত্যেক পর্বেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধিকারের জন্য সাংবাদিকদের সাহসী ভূমিকার ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে পাকিস্তানি শাসকদের সাথে আপস ও আঁতাতের কলঙ্ক। পূর্ব বাংলা গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণোন্মুখ পরিবেশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রত্যেকবার নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। জনমত সৃষ্টি, জনমতের বিশ্বস্ত বাহন হিসেবে সংবাদপত্রকে জনতার সামনে উপস্থাপিত করার কাজে সাংবাদিকরা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তাই পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিকরা বারংবার কারাবরণ করেছেন ও স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্রত্যক্ষ ছিল। তবে দু-একটি পত্রিকা সামরিক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার পর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী ছিল না ইত্তেফাক ছাড়া প্রধান ধারার অন্য কোনো পত্রিকা। তবে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বিপুল সমর্থন জুগিয়ে গেছে। শেখ মুজিবের স্বদেশ ও তার মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সমান্তরালে এগিয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলন। আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে, সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের দলকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে–সর্বোপরি তাঁকে এদেশের মুক্তিকামী জনগণের নামে অবিসংবাদিত জননেতা হিসেবে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র অমূল্য ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করেছে। দেখা গেছে যে, পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে যখনই গণ-আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা তাদের ওপর আরোপিত সব নিয়ন্ত্রণ, হুমকি, জেলের ভয় অতিক্রম করে ছাত্র, জনতা এবং রাজনীতিবিদদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত এদেশে সাহসী সাংবাদিকতার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, সাংবাদিকরা সংগ্রামী যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন, পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর প্রথম আঘাতেই তা ভেঙে যায়। হানাদারদের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল সংবাদপত্র অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মী ও সাংবাদিক। হানাদারদের গোলার আঘাতে একের পর এক আক্রান্ত হয় স্বাধীনতার সপক্ষের পত্রিকা অফিস ও কর্মরত সাংবাদিকরা।

২৫ মার্চ রাতেই কামানের গোলায় ধ্বংস করা হয় দ্য পিপল ও গণবাংলা পত্রিকার অফিস। গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন দ্য পিপল অফিসে কর্মরত ছয়জন সাংবাদিক। ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের অফিসটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ২৮ মার্চ দৈনিক সংবাদের অফিস প্যাট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অফিসে কর্মরত সাংবাদিক শহিদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মারা যান। ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস–২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সংবাদপত্র ছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সেই যাত্রা খুবই করুণ, মর্মান্তিক।

এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে আসছে যে, যে কোনো যুদ্ধে প্রথম মৃত্যু ঘটে সত্যের। সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণ এবং সাংবাদিকদের হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরবর্তী নয় মাসের জন্য সংবাদপত্র অফিস 'সত্যের কসাইখানা' হওয়ার পথ খুলে দেয়।

#

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

৩০.১১..২০২১ পিআইডি ফিচার